আধুনিক বাঙালির ফেভারিট লোকেশন

বসন্তকালীন সংখ্যা

চৈত্র ১৪৩০

দেখতে দেখতে বছর শেষ হয়ে এল। বাতাসে ধরেছে বেলা শেষের হাওয়া। সে হাওয়ায় চৈত্রের উদাস হাওয়ার আহ্বান। নতুন বছর আসছে, এক নতুন স্বপ্নের পশরা নিয়ে।বাংলা স্ট্রিট-এর পাতাতেও লেগেছে একই সঙ্গে এই পুরনোর যাইযাই আর নতুনের সোনালি হাওয়ার উতলা টান। এই সব নিয়েই এবারের সংখ্যা। চিরনতুনের ডাকের ইশারা বয়ে ভবিষ্যতের দিকে ভেসে যাবার অমোঘ ইঙ্গিত।

সম্পাদকীয়

আশিস পণ্ডিত

২০২৪-এর লোকসভা ভোট ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে যত দিন যাচ্ছে দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া ঘোর দুর্বিপাকের দিকে এগোচ্ছে। কিছুদিন আগেই সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছিল সরকারের চালু করা নির্বাচনী বন্ড সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক। প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চের মত ছিল , নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে তথা মোটা টাকা চাঁদার বিনিময়ে এই যে বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থাকে নির্বাচনে প্রভাব খাটানোর সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে এটা সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক।

এই সূত্রেই জানা গিয়েছিল ২০১৯-'২০ থেকে ২০২২-'২৩ পর্যন্ত এই সময়কালের মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলি এই বন্ড বাবদ বিপুল অর্থ সংগ্রহ করেছে। তখনই এই বন্ড বিক্রি বন্ধের নির্দেশও দেওয়া হয়। তখনই আরো বলা হয় ৬ মার্চের মধ্যে এস বি আই-কে এই ইলেক্টোরাল বন্ডের যাবতীয় হিসেব ও তথ্য জাতীয় নির্বাচন কমিশনের হাতে তুলে দিতে হবে। কিন্তু এস বি আই এই সময়ের মধ্যে এই তথ্য ও হিসেব কমিশনের হাতে তুলে না দিয়ে বদলে সময় চেয়েছে অন্তত ৩০ জুন পর্যন্ত। বিরোধী দলগুলির বক্তব্য এই তথ্য নির্বাচনের আগে সামনে এনে বিপদ বাড়াতে চাইছে না শাসক দল। এ নিয়ে একটি আদালত অবমাননার মামলাও করেছিলেন আইনজীবী প্রশান্তভূষণ, যার শুনানি ছিল ১১ মার্চ। এ লেখা যখন লিখছি তখন জানা যাচ্ছে সুপ্রীম কোর্ট এস বি আইয়ের আবেদন নাকচ তো করেছেই , করে অচিরেই এই তথ্য জমা দিতে বলেছেন। এখন দেখার, সুপ্রীম কোর্টের এই অবস্থানের পর এ বিষয়ে এস বি আই কী পদক্ষেপ নেয়।

আসলে ভারতের মতো একটি দেশে যে কোনো রকম আর্থ-রাজনৈতিক অনিয়মকে টিঁকিয়ে রাখার জন্য নানা কলকব্জা কাজ করে। কিন্তু খোদ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ লঙ্ঘন করা এবং করেও নির্বিকার থাকা কি আরো বড়ো কোনো বিপদের দিকেই দেশকে ঠেলে দেয় না ? অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতেও কি এ প্রশ্নের জবাব দেশের আপামর আমজনতা, যাঁদের ভোটেই এইসব রাজনৈতিক দলগুলি তাদের লম্বাচওড়া বক্তৃতাগুলি দিয়ে থাকে, তাঁরা পাবেন ?

সূচিপত্র

খরচ বাড়ছে, কিন্তু নিরাপত্তা ? Page 5
দীপক দাশ

মন্দার আশঙ্কায় বছর শুরু হল এবার Page 7
অলকেশ সামন্ত

বাড়ছে কম বয়েসে হৃদরোগ Page 9
দীপক সেন

মোবাইলে বুঁদ থাকা এখন অভ্যাস মাত্র Page 12
দীপক সোম

বাড়ছে নেশার প্রতি আকর্ষণ Page 14
তপতী ঘোষ

চলে গেলেন অসীমা মুখোপাধ্যায় Page 16
অলোকেশ দে

ইউরোপের ডায়েরি (দ্বিতীয় পর্ব) Page 18
ডা প্রভাত ভট্টাচার্য

রঙে রেখায় রাজপুতানা (প্রথম পর্ব) Page 25
আদিত্য সেন

সরস্বতী ও শ্রীপঞ্চমী (প্রথম পর্ব) Page 34
আদিত্য ঠাকুর

ফিরে দেখা (প্রথম পর্ব) Page 37
প্রদীপ শ্রীবাস্তব

রোমাঞ্চে ঘেরা ইতিহাসের পথে (প্রথম পর্ব) Page 40
বাবলু সাহা

বাংলার দ্বিতীয় সিনেমা হলও ভাঙ্গা পড়ল Page 43
চণ্ডী মুখোপাধ্যায়

অন্য জগৎ Page 45
নিজস্ব প্রতিবেদন

লেখা ১

খরচ বাড়ছে, কিন্তু নিরাপত্তা ?

দীপক দাশ

২০২৪-এর ভোট যত এগিয়ে আসছে আস্তে আস্তে শাসক দল এবং তাদের প্রচারমুখ্যের ব্যস্ততাও বাড়ছে। তিনি কখনো ময়ূরপুচ্ছ হাতে মন্দিরে পুজো দিতে যাচ্ছেন, ধ্যানে বসছেন, কিংবা স্কুবা ডাইভিং করছেন বা জলের তলায় গিয়ে পরিভ্রমণ করে আসছেন। প্রচারমুখ্য ভোটের আগে প্রচার করবেন, নিজের জমানার সুখ্যাতি করবেন এতে স্বভাবতই দোষ দেখেন না কেউই। দেখার কথাও না। অন্তত ভারতে গত কয়েক দশকে সেটাই নিয়ম। অন্তত সেটাই হয়ে আসতে দেখেছেন সবাই। দেখেছেন, কারণ ভোট বড়ো বালাই। কিন্তু যতই এ জিনিস স্বাভাবিক হোক না কেন, ২০২৪-এর কিছু অন্য বৈশিষ্ট্যও আছে।

আছে কারণ, সরকারি হিসেবই বলছে ইউ পি এ জমানার চেয়ে এই জমানায় মুখে যতই বলা হোক জনপ্রতি খরচ কিন্তু বেড়েছে ১৫০ শতাংশেরও বেশি। মূল্যবৃদ্ধি উধাও কথাটা যখন প্রচারমুখ্য বলছেন তখন দেখা যাচ্ছে স্রেফ আর কিচ্ছু না , এই জমানায় দুধ,তাজা ফল, দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি, প্যাকেটজাত খাবার ইত্যাদির দামই কেবল বেড়েছে বহু গুণ।

সেই সঙ্গে আছে মিডিয়ায় প্রতি মুহূর্তে বিজ্ঞাপিত আধুনিক হবার উপাদান , যেমন, পান , তামাক, প্রসাধন, চিকিৎসা , ঘরভাড়া, ইন্টারনেট পরিষেবা,মোবাইলের টক টাইম ইত্যাদি, অর্থাৎ নন ফুড আইটেম। এসব কিনতেই বেরিয়ে যাচ্ছে খরচের ৫৭ শতাংশ। অথচ ইউ পিএ জমানায় শেষ বছরে নিম্নবিত্ত আম জনতার গড় মাসিক খরচ গ্রামাঞ্চলে যা ছিল ২৬৩০ টাকা সেটাই ২০২২-২৩ এ এসে দাঁড়িয়েছে ৬৪৫৯ টাকায়।এই অঙ্কটা গ্রামে ছিল ১৪৩০ টাকা আর এখন এসে দাঁড়িয়েছে ৩৭৭৩ টাকায়।অঙ্কটা দেওয়া হল ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে অর্গানাইজেশন-এর মান্থলি পার ক্যাপিটা কঞ্জামশান এক্সপেনডিচার থেকে।

অর্থাৎ ? অর্থাৎ স্রেফ ১০ বছরে আয় বাড়েইনি তো বটেই কিন্তু খরচ বেড়েছে কয়েক গুণ। ফলে গরিবের সঞ্চয়ে টান পড়ছে বিরাট রকম। অথচ এই লেখা যখন লিখছি তার কিছুদিন আগে শাসক দলের প্রচারমুখ্য সরাসরিই বলছেন আগামী ৫ বছরে তার সরকার এমন ব্যবস্থা কার্যকর করবেন যাতে দেশবাসীর জীবনে সরকারের ভূমিকাই যাবে কমে। তাহলে কি সরকারকে ভোটে জিতিয়ে আনার পর দেশের মানুষের জন্যে ভাবনার দায়টুকুও নিতে যাতে না হয় এমন ব্যবস্থার কথাই বলছেন প্রচারমুখ্য ? সেই অদূর ভবিষ্যতে দেশের মানুষের দেখভালের দায় কে নেবেন তাহলে ?

লেখা ২

মন্দার আশঙ্কায় বছর শুরু হল এবার

অলকেশ সামন্ত

কর্পোরেট দুনিয়ায় দুটি দেশের নাম করলেই দেখা যায় প্রায় সব স্তরের মানুষই একটি না একটু নড়েচড়ে বসেন। দেশ দুটির নাম জাপান আর ইউ কে। আর মন্দার ধাক্কা যখন এই দুটি দেশকেও নাড়িয়ে দিতে পারে তখন বিষয়টি যে সারা দুনিয়াতেই কত্তাব্যক্তিদের যথেষ্ট চিন্তার কারণ হয়ে উঠবে ভতাতে সন্দেহ কী ! অঙ্ক বলছে গত ২০২৩ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর অর্থনৈতিক ত্রৈমাসিকে খোদ জাপানের অর্থনীতি ০.৪ শতাংশ সঙ্কুচিত হয়েছে। খবরটা পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু খোদ সে দেশের ক্যাবিনেট অফিসের দেওয়া তথ্য থেকেই। ওই অঙ্কই বলছে এই প্রথম নয়, এই সঙ্কোচন ঘটেছে আগের জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকেও। তখন অঙ্কটা ছিল ২.৯ শতাংশ। অর্থাৎ সঙ্কোচন কিন্তু চলছেই। পরপর দুটি ত্রৈমাসিকে যদি জিডিপি কমে তাহলে হিসেব মতো তাকে মন্দা বলে ধরতে বাধ্য অর্থনীতিক মহল। এবং আরো ঘটনা যেটা তা হল, বিশ্ব অর্থনীতির ক্রম তালিকায় দেশের অবস্থানাঙ্কের হেরফের। এই হিসেবে ক্রম তালিকায় জাপান এই মুহূর্তে চার নম্বরে, যেটাকেই এই মুহূর্তে রীতিমতো চিন্তার বলে মনে করছে বিশ্ব অর্থনীতিক মহল। কেবল জাপান কেন, ওয়াকিবহাল মহলের আশঙ্কা --- একই অবস্থা হতে চলেছে ইউ কে-রও। তারও জিডিপি কমেছে ওই গত অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিকে । হার ০.৩ শতাংশ। খাদ্যপণ্যের চড়া দাম, ভূ-রাজনৈতিক বিবাদ ইত্যাদির জেরে ভারতেও মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে লড়াইতে

আসল চ্যালেঞ্জ বলে কিছুদিন আগেই জানিয়েছিলেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর শক্তিকান্ত দাসের মতে ভূ রাজনৈতিক বিবাদ মাথাচাড়া দেওয়ায় মূল্যবৃদ্ধি কমায় বাধা সৃষ্টি করছে।

এই পরিস্থিতিতে দেখা যাচ্ছে কেবল ভারত নয়, সারা বিশ্বই চিন্তিত এইসব কিছুর মিলিত আরেকটি ফল নিয়ে : লে-অফ বা ছাঁটাই ।করোনা পরবর্তী সময়ে একটা কথা বাজারে বারবার শোনা গেছে এবং যায় যে, বাজারে চাহিদা নেই। এই অবস্থাটা চলছে গত তিন চার বছর ধরেই। হিসেব বলছে শুধু সংগঠিত ক্ষেত্রেই আমাদের দেশে এই ছাঁটাই বা লে-অফের সংখ্যাটা অবিশ্বাস্য প্রায়। আর সেই সঙ্গে অসংগঠিত ক্ষেত্র ধরলে ...। এবং এই অবস্থায় কর্পোরেট দুনিয়ার কাজ একটাই : ছাঁটাই বিষয়টারও একটা মানবিক মুখ বার করা। সেই উদ্দেশ্যে মাথা খাটাতে গিয়ে বেইয়ে আসছে অজস্র টার্ম : কেউ বলছেন রাইট-সাইজিং দ্য অর্গানাইজেশন , কেউ বলছেন নট ফিট ফর আওয়ার সিম্পলিফায়েড অপারেটিং মডেল, কারো জবানিতে বিষয়টা এগজিকিউটিং এ ওয়ার্কফোর্স অপটিমাইজেশন স্ট্র্যাটেজি, তো কারো মতে আবার কনডাক্টিং এ স্ট্র্যাটেজিক ডাউনসাইজিং। কিন্তু নাম যা-ই দেওয়া হোক বিষয়টা একটাই : এই মুহূর্তে আপনাকে আমাদের লাগছে না। শুধুমাত্র চলতি বছরেই শোনা যাচ্ছে ব্রিটেনে পোর্ট ট্যালবো কারখানার দুটি ব্লাস্ট ফার্নেস নাকি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে টাটা স্টিলের তরফে। এর ফলে কাজ হারাচ্ছেন অন্তত ২৮০০ মানুষ। কেবল এই কারখানাই নয়, লে অফের বন্যা চলেছে জন লুইস, এমব্রেসার, সিসকো, সিরিয়াস এক্স এম সহ অন্যত্রও। ওয়কিবহাল মহলের মতে এটা ব্রিটেনের পক্ষেও খুব ভালো কথা নয়। অর্থাৎ কিনা সদ্য শুরু হওয়া বছরটা মোটেই ভালো কাটতে যাচ্ছে না বলেই মনে করছেন তাঁরা।

লেখা ৩

বাড়ছে কম বয়েসে হৃদরোগ

দীপক সেন

করোনা পরিস্থিতি কাটিয়ে আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে পৃথিবী --- এমনটাই বলছেন ওয়াকিবহাল মহল। কিন্তু এই ঘুরে দাঁড়ানোর সময়েই নানা বিঘ্ন বিপদের আশঙ্কায় কপালে ভাঁজ পড়তে শুরু করেছে বিশ্বের চিকিৎসক মহলে। বাস্তবিক অর্থেই তাঁরা লক্ষ্য করেছেন পরিযায়ী শ্রমিক, তথ্য প্রযুক্তি কর্মী , চিকিৎসক বা সেলেব্রিটি --- সমস্ত মহলেই আকস্মিক হার্ট অ্যাটাক এক ভয়ঙ্কর আশঙ্কা বয়ে আনছে। দেখা যাচ্ছে এই আশঙ্কা প্রধানত বাড়ছে প্রধানত যুবক-যুবতীদের মধ্যে। দেখা যাচ্ছে আগে যাঁরা হৃদরোগে আক্রান্ত হতেন তাঁদের মধ্যে ১৫-২০ শতাংশই ছিলেন কম বয়েসী। কিন্তু করোনা পরবর্তী সময়ে এই ছবিটাই বদলে গেছে আমূল।কার্ডিওলজিস্টদের একাংশই বলছেন যে এখন প্রতি তিনটি হার্ট অ্যাটাকের কেসের একটি নাকি ৪৫ বছরের নিচে। আর সাডন কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের কারণে মৃত্যুর ক্ষেত্রে প্রত্যেক দুটি কেসের মধ্যে একটিই নাকি ৪০-এর নিচে। তাঁদের বক্তব্য, এর পেছনে প্রধান কারণ হল জিন বা পারিবারিক ইতিহাস, ধূমপান, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, পানীয়ে চিনি দিয়ে খাওয়া ইত্যাদি।

তাহলে কি করোনার মতো এটাও আরেকটা মারাত্মক মহামারীর আকার নিতে যাচ্ছে ? প্রশ্নের জবাবে মিলছে তথ্য যে,করোনা পরবর্তী কালে অস্বাভাবিক হারে হৃদরোগ আর ফুসফুসের সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় বিশ্ব জুড়েই চলছে গবেষণা। সেই সঙ্গে বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাগুলি সংক্রামক রোগগুলির আরও কার্যকরভাবে মোকাবেলা করার জন্য অভিযোজিত হয়েছে। সেবা ব্যবস্থা পরিচালনায় নজরদারি, দ্রুত প্রতিক্রিয়া এবং নমনীয়তার উপর বর্ধিত ফোকাস রাখা হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে , যাতে এরকম কোনো বিপদ আচমকা আমাদের ওপর এসে হামলা না করতে পারে। করোনা বুঝিয়ে দিয়েছে রোগের বিস্তার নিয়ন্ত্রণে টিকাদান অভিযান কতটা গুরুত্বপূর্ণ। কোভিড-পরবর্তী যুগে, বিভিন্ন রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে ভ্যাকসিন তৈরি করা হচ্ছে এবং দ্রুত বিতরণ করা হচ্ছে । কোভিড-১৯ মহামারী থেকে এই শিক্ষা থেকে নেওয়া হয়েছে বলে জানাচ্ছেন চিকিৎসকরা।

মহামারী টেলিমেডিসিন এবং ডিজিটাল স্বাস্থ্য বিষয়ক ব্যবস্থা গ্রহণকে ত্বরান্বিত করেছে। কোভিড-পরবর্তী সময়ে এই প্রযুক্তিগুলি স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

মহামারীটির মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তার গুরুত্বকে বুঝতে সাহায্য করেছে। কোভিড-পরবর্তী মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যাগুলির বিষয়ে একটি উচ্চ সচেতনতা এবং মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস বৃদ্ধি পেয়েছে। মহামারীটি অন্তর্নিহিত স্বাস্থ্যের অবস্থার পাশাপাশি ব্যক্তির দুর্বলতা তুলে ধরেছে বলেও তাঁরা জানাচ্ছেন। কোভিড-এর পরে, সংক্রামক রোগ থেকে জটিলতার ঝুঁকি কমাতে কার্যকরভাবে দীর্ঘস্থায়ী রোগ পরিচালনার উপর নতুন করে জোর দেওয়া হয়েছে।

মহামারীটি সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিশ্বব্যাপী সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরেছে। কোভিড-পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন দেশ যে কোনো স্বাস্থ্য হুমকি মোকাবেলায় ডেটা, সংস্থান এবং দক্ষতা ভাগ করে নেওয়ার জন্য একসঙ্গে কাজ করে চলেছে।

মহামারী বিদ্যমান স্বাস্থ্য বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে, যা স্বাস্থ্যসেবা অ্যাক্সেস এবং বিতরণে বৃহত্তর ইক্যুইটির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। কোভিড-পরবর্তী সময়ে পদ্ধতিগত বৈষম্য মোকাবেলা করার এবং স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবা সকলের জন্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও জানাচ্ছেন তাঁরা।

মহামারীর অভিজ্ঞতা প্রস্তুতি এবং প্রতিরোধের কৌশলগুলির গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছে। কোভিড-এর পর ভবিষ্যতে এধরনের যে কোন সংক্রমণের প্রাদুর্ভাব রোধ করতে

নজরদারি, প্রাথমিক সনাক্তকরণ এবং সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণের উপর নতুন করে ফোকাস করা হয়েছে।

সংক্ষেপে, কোভিড-পরবর্তী রোগের ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতা, উদ্ভাবন এবং বর্তমান এবং ভবিষ্যতের স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জগুলি কার্যকরভাবে মোকাবেলা করার জন্য স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে বলেই জানাচ্ছেন তাঁরা।

লেখা ৪

মোবাইলে বুঁদ থাকা এখন অভ্যাস মাত্র

দীপক সোম

‘মোবাইল ম্যানিয়া’ শব্দটি এই মুহূর্তে সাধারণত স্মার্টফোন এবং ট্যাবলেটের মতো মোবাইল ডিভাইসের প্রতি ক্রমবর্ধমান নির্ভরতা এবং আবেশকে বোঝাতেই ব্যবহার করা হয়। এই প্রবণতা কয়েক বছর ধরে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর কমার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। মোবাইল ম্যানিয়ার ক্রমবর্ধমান প্রসারের পিছনে বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে : মোবাইল ডিভাইসগুলি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও শক্তিশালী, বহুমুখী এবং সাশ্রয়ী হয়েছে। মোবাইল প্রস্তুত করে যে সব সংস্থা তারা এখন বিস্তৃত বৈশিষ্ট্য এবং কার্যকারিতা অফার করে যা মোবাইলকে দৈনন্দিন জীবনে অপরিহার্য করে তুলতে পারে। মোবাইল নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ এবং Wi-Fi হটস্পটগুলির যত সজলভ্য মানুষকে মোবাইল ডিভাইসের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে উৎসাহিত করে। সোশ্যাল মিডিয়া হচ্ছে লোকেরা প্রায় যে কোনো জায়গায়, যে কোনো সময় ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করতে পারে। এই সুবিধা প্ল্যাটফর্ম, অ্যাপের আধিক্য সহ, মোবাইল তাই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। সংযুক্ত থাকা, অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়া এবং অন্যদের সঙ্গে জড়িত থাকার প্রয়োজনীয়তা মানুষকে তাদের মোবাইল ডিভাইসে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সময় ব্যয় করতে অভ্যস্ত করে। পাশাপাশি মোবাইল ডিভাইসগুলি পোর্টেবল বিনোদন কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে, যা ব্যবহারকারীদের ভিডিও স্ট্রিম করতে, গান শুনতে, গেম খেলতে এবং চলতে চলতে ডিজিটাল মিডিয়ার অন্যান্য রূপগুলি ব্যবহার করতে দেয়। লোকে তাদের মোবাইল ডিভাইসগুলি ইমেল যোগাযোগ, নথি

সম্পাদনা এবং প্রকল্প পরিচালনার মতো কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত কাজের জন্য ব্যবহার করে। দূর থেকে কাজ করার এবং যে কোনো জায়গা থেকে সক্রিয় থাকার ক্ষমতা মোবাইল প্রযুক্তির উপর নির্ভরতাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

মোবাইল ডিভাইস কল, টেক্সট, ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং অ্যাপস এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করতে সাহায্য করে। বন্ধু, পরিবার এবং সহকর্মীদের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার সুবিধা মোবাইল ডিভাইসের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারে অবদান রাখে। ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম এবং মোবাইল পেমেন্ট সিস্টেমের উত্থান মোবাইল ব্যবহার করে কেনাকাটা করা এবং আর্থিক লেনদেন করা সহজ করে তুলেছে। যদিও মোবাইল প্রযুক্তি অনেক সুবিধা এবং সুবিধা দেয় কিন্তু অত্যধিক ব্যবহারের ফলে উৎপাদনশীলতা হ্রাস, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং এমনকি আসক্তির মতো সমস্যা হতে পারে। মোবাইল ম্যানিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত নেতিবাচক পরিণতিগুলি এড়াতে স্বাস্থ্যকর ভারসাম্য বজায় রাখা এবং দায়িত্বের সঙ্গে মোবাইল ব্যবহার করা অপরিহার্য। কিন্তু হিসেব বলছে ভারতের ৫০ শতাংশ মোবাইল ব্যবহারকারীই জানেন না তাঁরা মোবাইল কেন খুলছেন। ৮৪ শতাংশ মোবাইল ব্যবহারকারীই ১৫ মিনিট অন্তর মোবাইল চেক না করলে অস্বস্তি বোধ করেন। এঁদের মধ্যে ৩১ শতাংশই সকালে ঘুম থেকে উঠেই সব থেকে আগে মোবাইল হাতে নেন। ফলে দেখা যাচ্ছে একজন ভারতীয় দিনে অন্তত ৮০ বার নিজের মোবাইল খোলেন। লো ব্যাটারি, খারাপ ওয়াই ফাই সংযোগ বা পুওর ডেটা সিগন্যাল তাঁদের কাছে আতঙ্ক।৫০-৫৫ শতাংশ ভারতীয়ই মোবাইল ব্যবহার করেন ওটিটি, রিলস আর ভিডিও বা মিউজিক দেখতে বা শুনতে।

এর ফলে মোবাইলের উপর মানুষের নির্ভরতা কেবল বাড়ছেই না সেই সঙ্গে কমছে নিজের উৎপাদনশীলতাও।

লেখা ৫

বাড়ছে নেশার প্রতি আকর্ষণ

তপতী ঘোষ

পানমশলাই বলুন, বা গুটখা , কিংবা এমনকি পান --- নতুন প্রজন্মের দৈনন্দিন জীবনে নাকি এই ধরনের নেশাদ্রব্যের ব্যবহার নাকি কমছে। এই সেদিনও এক প্রবীণের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তাঁর মতে, নতুন প্রজন্মের শিক্ষিত মহলে যত দিন যাচ্ছে এই ধরনের নেশার প্রতি অনীহাই নাকি চোখে পড়ছে তাঁর। বিশেষ করে ধূমপানের বিষয়ে তো বটেই। 'তা বলে কি পথেঘাটে কাউকে সচরাচর সিগারেট খেতে দেখা যায় না ? নিশ্চয় বিষয়টা তা নয়। কিন্তু ধূমপানের ব্যাপারে সচেতনতা কিছুটা যেহেতু জেগেছে, ফলে নতুন প্রজন্ম চাইছে এসবের থেকে দূরে থাকতে। এটুকুও তো যথেষ্ট...' বলছিলেন তিনি।

কিন্তু ঘটনাটা কি সত্যিই তা-ই ? সম্প্রতি ন্যাশনাল স্যাম্পল সারভে কমিশন, পরিসংখ্যান ও প্রকল্প রূপায়ণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অন্তত সেরকম কথা বলছে না বলেই দেখা যাচ্ছে। তাদের ২০২২-'২৩ সালের হাউজহোল্ড কনজামশন এক্সপেনডিচার সার্ভে অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে দেশের গ্রাম ও শহরে গত ২০১১-'১২ সালে পড়াশোনার খরচ ছিল মোট আয়ের ৩.৪৯ ও ৬.৯০ শতাংশ, যেটা ২০২২-'২৩ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ৩.৩০ এবং ৫.৭৮ শতাংশ। অর্থাৎ অঙ্কটা কমেছে আশঙ্কাজনকভাবে, যেখানে পান-তামাকসহ বিভিন্ন নেশাদ্রব্যে এই খরচ ২০১১-'১২ সালে ছিল গ্রাম ও শহরের নিরিখে মোট আয়ের ৩.২১ ও ১.৬১ শতাংশ সেখানে ২০২২-'২৩ সালে এই খরচই বেড়ে দাঁড়িয়েছে কিন্তু ৩.৭৯

এবং ২.৪৩ শতাংশে। দেশের বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মোট ২ লক্ষ ৬১ হাজার ৭৪৬ টি বাড়ি থেকে পাওয়া এই রিপোর্টে নড়েচড়ে বসার কারণ দেখছেন বইকি ওয়াকিবহাল মহল। তাঁদের মতে এ থেকে যেটা বেরিয়ে আসছে ত হল গত কয়েক বছরে জনজীবনের চেহারার বিচিত্র রদবদল। এই কবছরে যেখানে পড়াশোনার জন্য জরুরি প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্যান্য ক্ষেত্রে সঙ্গে তাল রেখে খরচ বেড়েছে বই কমেনি সেখানে পড়াশোনার ক্ষেত্রে খরচের হার অপেক্ষাকৃত কমে নেশা দ্রব্যের ক্ষেত্রে খরচ বৃদ্ধি এক অশনি সংকেতের ইশারাই বহন করে আনছে। এখনই সামাজিকভাবে নজর দেওয়া না হলে অচিরেই চেহারাটা আরো আশঙ্কাজনক হয়ে উঠবে বলেই তাঁদের ধারণা।

এ বিষয়ে আমরা কথা বলেছিলাম সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক মহলের একাংশের সঙ্গে। তাঁদের বক্তব্য সরকারি বিভিন্ন নীতি ও পরীক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন ফাঁক, শিক্ষা শেষে চাকরি পাবার অনিশ্চয়তা, নানা দুর্নীতি এবং সরকারি ও সামাজিক স্তরে দলভিত্তিক রাজনীতিকেন্দ্রিকতা পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে যত অনিশ্চয়তা তুলে ধরবে, মূল্যবোধের ক্ষেত্রে অবনমন ডেকে আনবে ততই প্রচলিত শিক্ষার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা দেখা দিতে বাধ্য। এবং সেই হতাশা ও মূল্যবোধের অবনমন জনিত কারণেই সামাজিক স্তরে নেশা দ্রব্যের প্রতি আকর্ষণও জাগতে বাধ্য। এখনই সচেতন না হলে , তাঁরা বলছেন, এর ফল বিষবহ হতে বাধ্য।

লেখা ৬

চলে গেলেন অসীমা মুখোপাধ্যায়

অলোকেশ দে

আবারও নক্ষত্রপতন বিনোদন জগতে।

না ফেরার দেশে পাড়ি দিলেন স্বনামধন্য গায়িকা, টলিউডের উজ্জ্বল নক্ষত্র তথা জনপ্রিয় কিংবদন্তি অসীমা মুখোপাধ্যায়। নিজের বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। গত কয়েকমাস ধরেই অসুস্থ ছিলেন অসীমাদেবী। পারকিনসন্সেরও সমস্যায় ভুগছিলেন। শেষমেশ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারালেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া পড়েছে বিনোদন জগতে।

গায়িকা থেকে সুরকার প্রযোজক হিসেবে প্রভূত সুখ্যাতি ছিল অসীমা মুখোপাধ্যায়ের। ‘চৌরঙ্গী’ , ‘মেমসাহেব’ , ‘বাঘবন্দী খেলা’ সহ উত্তমকুমারের একাধিক কালজয়ী সিনেমায় অসীমা দেবীর প্রযোজনাতেই কাজ করেছেন মহানায়ক। একটা সময় কাজের সূত্র ধরেই সম্পর্ক পৌঁছে গিয়েছিল পারিবারিক জায়গায়। নিজের কোনো বোন ছিল না বলে অসীমা মুখোপাধ্যায়ের থেকে প্রতি বছর ভাই ফোঁটা নিতেন মহানায়ক। তাঁকে দিদি বলে ডাকতেন। অসীমা মুখোপাধ্যায়ের আরও একটি পরিচয় হল তিনি অভিনেতা পার্থ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী। উত্তম কুমারের সঙ্গে একাধিক ছবিতে তিনিও কাজ করেছেন। কয়েক

বছর আগে , ৭০ বছর বয়সে বার্ধক্যজনিক সমস্যায় তিনি মারা যান। এবার পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চিরঘুমের দেশে পাড়ি দিলেন তাঁর স্ত্রী অসীমা মুখোপাধ্যায় ।

কালজয়ী ‘চৌরঙ্গী ‘ সিনেমার ‘বড়ো একা লাগে এই আঁধারে’ সঙ্গীতপ্রেমীদের মনে আজীবন থেকে যাবে। সম্প্রতি ‘চৌরঙ্গী ‘ সিনেমার অভিনেত্রী অঞ্জনা ভৌমিকও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সেই ছবির সঙ্গীত পরিচালনাও করেছিলেন অসীমাদেবী।

ইউরোপের ডায়েরি (দ্বিতীয় পর্ব)

ডা প্রভাত ভট্টাচার্য

চলে এলাম ফ্রান্স-এ। রাত হয়ে গেছে। রাস্তায় লোকজন, গাড়ি চলাচল কম। এখন সোজা হোটেল।

এ হোটেলটা অত বড় নয়। সারাদিন ঘুরে সবাই ক্লান্ত । খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়া হল। কাল সকালে ঘুরতে যাওয়া।

আইফেল টাওয়ার দেখব তো? নীলাঞ্জনা বলল।

অবশ্যই। আমি জবাব দিলাম।

ফ্রান্স হল পশ্চিম ইউরোপের একটি দেশ। এই দেশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল গল জাতির দ্বারা এবং পরে এই দেশ রোমের সঙ্গে যুক্ত হয়। ইংল্যান্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের যুদ্ধ লেগেই থাকত । মধ্যযুগে হাণ্ডরেড ইয়ারস ওয়র ছিল বিখ্যাত। ফরাসি নবজাগরণ বা রেনেসাঁ ছিল এই দেশের এক গৌরবময় অধ্যায় ,যার মাধ্যমে এই দেশের সাংস্কৃতিক বিকাশের উন্নতিসাধন হয়। আর ফরাসি বিপ্লব তো বিশ্ববিখ্যাত । পরবর্তীকালে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই দেশ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল ।

ফ্রেঞ্চ হল এই দেশের সরকারী ভাষা। এই দেশের সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাস বেশ সমৃদ্ধ। বিখ্যাত দার্শনিক ও সাহিত্যিকদের মধ্যে ছিলেন ভলতেয়ার, রুশো, ভিক্টর হুগো,

আলেকজান্ডার ডুমা, জুলে ভার্নে এমিল জোলা, জা পল সাত্র প্রমুখ। ফ্যাশন ও বিনোদনের জগতেও এই দেশ উৎকর্ষের স্বাক্ষর রেখেছে ।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট সারার জন্য নামা হল ।

এখানে দেখলাম ফ্রেঞ্চ ছাড়া অন্য ভাষা কেউ বোঝে না। নীলাঞ্জনা ভালো ফ্রেঞ্চ জানে, তাই খুব সুবিধে হল। নুন, ডিম, এইসবও ওদের ভাষায় চাইতে হল।

তাহলে আমার ফ্রেঞ্চ শেখা কাজে দিচ্ছে। নীলাঞ্জনা বলল হাসিমুখে।

সে তো বটেই। বললাম আমি।

এদের ফ্রেঞ্চ লোফটা খুব ভালো খেতে।

ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়া হল সিটি ট্যুরের জন্য। নতুন গাইড ইউসুফ প্যাটেল স্বাগত জানাল সবাইকে। বিখ্যাত শেন নদীর ধার দিয়ে যাওয়া হল। বাস থেকেই দেখা। রাস্তায় গাড়ি, লোকজন অনেক, কিন্তু লন্ডনের মত অত ট্রাফিক জ্যাম নেই। প্যারিস এক সুন্দর সাজানো শহর। রাস্তার ধারে লোকজন চেয়ার পেতে বসে গল্প করতে করতে খাচ্ছে, বেশ আড্ডার মেজাজে।

প্রথমে দেখা হল গ্রেভিন ওয়াক্স মিউজিয়াম।

ইংল্যান্ডে তো মাদাম তুসো মিউজিয়াম রয়েছে। নীলাঞ্জনা বলল ।

হ্যাঁ, বিশ্ববিখ্যাত মাদাম তুসো মিউজিয়াম। এবারে দেখা হল না। পরে আবার দেখা যাবে। বললাম আমি। সিঙ্গাপুরেও আছে মাদাম তুসো মিউজিয়াম।

খুব ভালো লাগলো এই ওয়াক্স মিউজিয়াম দেখে। অনেক বিখ্যাত মানুষের স্ট্যাচু রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে খেলোয়াড়, রাষ্ট্রনায়ক ,চিত্রতারকা,গায়ক ,চিত্রকর, ভাস্কর প্রভৃতির স্ট্যাচু ।

প্রচুর ছবি তোলা হল। এখানে ছবি তোলায় কোনো বাধানিষেধ নেই। মহাত্মা গান্ধীর ছবির সামনে রূপকথার ছবি তোলা হল।

এরপর দেখা হল আইফেল টাওয়ার। আইফেল টাওয়ারকে ফ্রান্স ও প্যারিসের প্রতীক বলা যায়। এটি তৈরি হয় 1889 সালে এবং এর নামকরণ হয় গুস্তাভ আইফেলের নামানুসারে যার কোম্পানি এই টাওয়ারের নক্সা তৈরি করেছিল। এটি তৈরি হয়েছিল রট আয়রণ দিয়ে , ফরাসী বিপ্লবের শতবর্ষকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য। ব্রিটেনের প্রিন্স অফ ওয়েলস এর উদ্বোধন করেন। এর উচ্চতা প্রায় একাশি তলা বাড়ির সমান। একসময় এটিই ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু জিনিস।

আইফেল টাওয়ারের তিনটে ফ্লোর আছে – ফার্স্ট লেভেল, সেকেন্ড লেভেল, আর সবার ওপরে সামিট। প্রত্যেক কোণে ছবি রাখা রয়েছে। ওঠবার জন্য রয়েছে এলিভেটর । দুটো রেস্টুরেন্ট আছে।

টিকিট কেটে ভেতরে ঢোকা হল। তার পরে এলিভেটরে করে সোজা চলে গেলাম ওপরে।

অসাধারণ! বলে উঠলো নীলাঞ্জনা।

রূপকথার ভালো লাগছে? আমি বললাম।

খুব ভালো লাগছে।

সত্যিই, ভালো লাগার মতই জায়গা।

নিচের গার্ডেনটা এখান থেকে কি সুন্দর লাগছে। আমি বললাম।

সব ঘুরে ঘুরে দেখা হল, ছবি তুলতে তুলতে।

একটা বোর্ড রয়েছে, মন্তব্য লিখে দেওয়ার জন্য। নীলাঞ্জনা সেখানে লিখে দিল তার মন্তব্য। এরপর নীচে নেমে আসা হল। প্রচুর মানুষ দেখতে এসেছেন এই অসাধারণ সৃষ্টি, পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে।

এবারে দেখতে যাওয়া হল ল্যুভর মিউজিয়াম।

ল্যুভর মিউজিয়াম হল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আর্ট মিউজিয়াম এবং ফ্রান্স তথা প্যারিসের এক গুরুত্বপূর্ণ দর্শনীয় স্থান। এটি প্রথমে তৈরী হয়েছিল একটি দূর্গ হিসেবে, 1190 সালে, যা পরে রাজপ্রাসাদ হিসেবে পুনঃনির্মিত হয়। 1793 সালে এটিকে খুলে দেওয়া হয় মিউজিয়াম হিসেবে। সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ক্ষমতায় আসার পর সাময়িকভাবে এই মিউজিয়াম তার নামে করেছিলেন। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে, যখন নাৎসী বাহিনী প্যারিসে প্রবেশ করে, তারা এই মিউজিয়াম দখল করে। তবে তারা আসার আগেই মিউজিয়ামের লোকজন বেশিরভাগ জিনিসপত্র সরিয়ে দেয়। নাৎসীরা এসে মিউজিয়াম ফাঁকা দেখে এই জায়গাকে ক্লিয়ারিং হাউস হিসেবে ব্যবহার করে।

এখানে প্রচুর ছবি, মূর্তি প্রভৃতি আছে। এ সব দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল বিশ্ববিখ্যাত মোনালিসার ছবি। এই ছবি এঁকেছিলেন রেনেসাঁ যুগের বিখ্যাত ইতালিয়ান দার্শনিক, ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী লিওনার্দো দ্যা ভিনচি ।এটি হল একটি অয়েল পেন্টিং। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত এবং সর্বাধিক আলোচিত ছবি। সম্ভবত 1506 সালে এই ছবির কাজ সম্পূর্ন হয়েছিল ।

এই ছবির বিশেষত্ব হল মোনালিসার রহস্যময় হাসি। মোনালিসা, মানে যার ছবি আঁকা হয়েছিল ,পরিচিত ছিলেন লা জিওকোন্ডা নামে, যিনি ছিলেন ফ্রানসেস্কো লা জিওকোন্ডার স্ত্রী ।জানা গিয়েছিল যে তাদের নতুন বাড়িতে স্থানান্তরিত হওয়া এবং দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম উপলক্ষে এই ছবি আঁকা হয়েছিল। বলা হয়, এই যে রহস্যময় হাসি তা হল অপটিকাল ইলিউশনের জন্য ।চোখ থেকে ঠোঁটের দিকে ফোকাস পড়লেই মনে হবে হাসছে। এই ছবি চুরি করেছিল এক ইতালিয়ান চোর, ১৯১১ সালে।

আরো অনেক ছবি, মূর্তি সব দেখা হল।

আমার তো এইসব দেখতে খুবই ভালো লাগে। বেশ খানিকটা সময় কেটে গেল এখানে।

বাইরে বেরিয়ে যাওয়া হল খাবারের খোঁজে । বেশ ক্ষিধে পেয়েছে।

ম্যাকডোনাল্ডে খাওয়া হল। এখানেও একই ব্যাপার, ফ্রেঞ্চ ছাড়া কেউ কিছু বোঝে না। নীলাঞ্জনার ফ্রেঞ্চ কাজে দিল এখানেও।

জল এখানে বেশ দামী। একটা ছোটো জলের বোতলের দামই একশো দেড়শো টাকা। ছোটো আইফেল টাওয়ারের রেপ্লিকা কেনা হল একজনের থেকে। একটা দোকান থেকে বড় রেপ্লিকাও কেনা হল।

এবারে একটু রাস্তাঘাট ঘুরে দেখা হল। প্রচুর দোকান – জামাকাপড়, ব্যাগ, জুতোর দোকানই বেশী। কফি খাওয়া হল এক জায়গায়।

এর পর দেখা হল বিখ্যাত নোতর দাম ক্যাথেড্রাল । এই গির্জা বহু প্রাচীন এবং খুবই বিখ্যাত। এটি গথিক রীতিতে নির্মিত হয়েছিল ।পরবর্তীকালে কয়েকবার এর সংস্কারসাধন হয়েছে। ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়নের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান এখানেই অনুষ্ঠিত হয়। এই গির্জা আলোচিত হয়েছে ভিক্টর হুগোর বিখ্যাত বই , দ্য হানচব্যাক অফ নোতরদাম এ।

দেখা হল ঐতিহ্যময় এই স্থান। এরপর রাতের খাওয়া ভারতীয় রেস্তোরাঁয় ।শেষে পায়েস পেয়ে খুব ভালো লাগলো। পায়েস আমার খুব প্রিয়।

তারপর সবাই হোটেলে ফিরে এলাম। গ্রুপের সবাই একসাথে কথাবার্তা, গল্পগুজব করতে লাগলো। এই কদিন আমরা সবাই যেন এক পরিবারের মতো। বেশ কিছুক্ষণ পরে চলে গেলাম যে যার ঘরে।

কাল যাওয়া হবে সুইজারল্যান্ড ।

পরদিন ব্রেকফাস্টের পরে আমরা রওনা দিলাম সুইজারল্যান্ডের উদ্দেশ্যে । বেশ দীর্ঘ যাত্রাপথ । চললাম পথের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে করতে। তাপমাত্রা ক্রমশ কমছে। অবশেষে যখন সুইজারল্যান্ড এসে পৌঁছলাম , বেশ ঠান্ডা। আমার অবশ্য ঠান্ডাই ভালো লাগে।

সুইজারল্যান্ড এসে গেছি! বরফ দেখব। রূপকথা বলে উঠল।

আমরা সবাই দেখবো । পাশ থেকে বলল একজন।

এর পর আগামী সংখ্যায়

রঙে রেখায় রাজপুতানা (প্রথম পর্ব)

আদিত্য সেন

বশিষ্ঠ মুখার্জি এক সৃষ্টিছাড়া মানুষ। কথাবার্তাতেও বড় অদ্ভুত। বলে, আমি শব্দ দেখি, রঙ শুনি। বশিষ্ঠ আধুনিক শহরের আকাশ-ছোঁয়া ইমারতের মাঝে থেকেও, লেফ্ট-হ্যাণ্ড বিদেশী গাড়ি চালিয়েও স্বভাবে অনেকটা গ্রাম্য রয়ে গেছে। মনটাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় ছায়াঘেরা বিশাল প্রান্তরের পথে। অনেক সময় মানুষের আম-দরবারে। তাই ওর কথাবার্তা বা চালচলন চট্ করে বোঝা যায় না। বশিষ্ঠ কেন চিরকুমার রয়ে গেল, চেনাশোনা সকলের তাতে কৌতূহলের সীমা নেই। যদিও ক্যানভাসে জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে এমন রূপসী মেয়ে বা খেটে-খাওয়া মজুরণীর প্রতি আকর্ষণ এখনও নেহাৎ কম নেই। বলে, ওরাই তো মায়া ছড়িয়ে শিল্পসৃষ্টিটাকে সচল রেখেছে। পোষাক বলতে চুড়িদার পাজামা ও রঙিন খাদির পাঞ্জাবি। একটি বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানের ভিসুয়ালাইজার। কোনরকম বন্ধন মেনে চলা স্বভাব নেই। অফিসে যায় কি যায় না। পকেটে পদত্যাগপত্র রেখে ওপরওয়ালাদের সঙ্গে নির্ভীকভাবে কথা বলে, অনেক সময় তর্কে মাতে। কোন বিশেষ কাজে মতের অমিল হলে ছুটি নিয়ে পনেরো দিন বেপাত্তা হয়ে যায়। তখন কোথায় যায়, কী করে কাউকে তার জবাবদিহি করে না। অফিসের নিয়মশৃঙ্খলা ভাঙ্গলে ওর ভয়ে ওর ওপরওয়ালাই কাঁটা হয়ে থাকেন; বশিষ্ঠের প্রতি উনি নিজেও যেন একটু দুর্বল, কারণ লক্ষ্য করে দেখেছেন, বশিষ্ঠ পদমর্যাদা, প্রতিপত্তি বাস্তবিকই তোয়াক্কা করে না অথচ মেজাজে থাকলে চমৎকার কাজ করে --- সবার চেয়ে সেরা। ছন্নছাড়া মানুষটির

প্রতি উনি বোধহয় একটু বেশি অনুরক্ত, হয়ত নিজে শিল্পী বলেই। তবে অফিসের স্বার্থে কখনও মুখ ফুটে সেটা বলেন না। গরুর পালেরা যখন আছে, অফিসের কাজ সামলাবার ভাবনা কি !

বশিষ্ঠ রোজ দাড়িগোঁফ কেটেছেঁটে পরিষ্কার করার পক্ষপাতী নয়। বলে, মরব যখন শরীরের অরিজিনাল জিনিসগুলি নিয়েই মরব। কিছু বাদ দিলেই ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয়, খোয়া যায়। কখনও-বা হাসতে হাসতে বলে, আরে, মুখমণ্ডলের জঞ্জালগুলি বড় প্রয়োজনীয় জিনিস, ওটা যদি অহরহ তোমাকে চাবুক মারে, রূপের অহংকার অত মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে না। আবার নিজেকে লুকিয়ে রাখতেও বড় সুবিধে ।

লাজপত নগরের একটা বাড়ির দোতলাটা বশিষ্ঠের স্টুডিও। ওটা ওর বাসস্থানও বটে। ক'দিন হল বড় ঘরটাকে নূতনভাবে সাজিয়েছে। পুরনো সিরিজের পেইন্টিং সব উঠিয়ে ফেলেছে। রঙ তুলিরও বদল ঘটেছে। সরকার পালটাবার পর সেক্রেটারীদের রদবদলের মতো রোজই আলমারীর বইপত্রগুলি কিছু না কিছু অদলবদল ঘটেছে। এখন হাতের কাছে যা বইপত্র --সব রাজস্থানের ওপর; ছবির বইও। শুধু পিকাসো ও ভ্যান গ'-এর আর রেমব্রাঁ-র আঁকা ছবির বইগুলি বশিষ্ঠের নিত্যসঙ্গী; ওগুলো শুধু সরায়নি। তবে বারান্দায় টব পালটেছে। বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের পোড়ামাটির টব এনেছে; তাতে ইদানীংকালের যেসব ফুল ফোটে- বেশির ভাগই হলদে রঙ। হলুদ রঙটা নিয়ে নিজেও একটু বেশি নাড়াচাড়া করছে আজকাল। ফুলও যেন মনের খোরাক মেটাতেই ফোটে। ভুবনেশ্বর থেকে একটা ফুল গাছ এনেছিল বশিষ্ঠ। এই ফুলের কি নাম জানা হয়নি, কারণ একদিন বাগানে বেড়াতে বেড়াতে দেখেছিল ছোট ছোট হলুদ রঙের ফুলে বাগানটা যেন একটা ট্রাইবাল রূপ পেয়েছে। মালিকে ডেকে বলেছিল, এই গাছটার একটা চারা পেলে ভাল হয়। সেই ফুল টবে অজস্র ফুটে আছে-- বশিষ্ঠ তার নাম দিয়েছে ভুবনেশ্বরী। ওর এরকম উদ্ভট সব ব্যাপার ।

বন্ধুবান্ধবদের ছড়াছড়ি থাকলেও বশিষ্ঠের আপনজন বলতে কেউ নেই। বেশ ক'বছর হল মা-বাবা গত হয়েছেন। ছোট ভাই চাকরীর কল্যাণে বৌ নিয়ে বোম্বাইতে থাকে। এমনিতে তার সময় নেই কিন্তু দাদাকে ভীষণ ভালোবাসে। মাঝেমধ্যে চিঠি লেখে দাদাকে, ভাল থেকো, সুস্থ থাকার চেষ্টা কোর। তাতে তোমার চেয়ে আমাদেরই লাভ বেশি। অসুস্থতার খবর পেয়ে ছুটে যেতে হবে না। বশিষ্ঠ উত্তর দেয়, শরীরটা আছে কেন জান ত? সুন্দর পৃথিবীটা দেখব বলে। এ ব্যাপারে তোমাদের যেন কোন ভুল না হয়।

বশিষ্ঠ মনে করে এরা ছাড়া ওর আর কেউ নেই। অন্য নিকট ও দুরের কিছু আত্মীয়স্বজনেরা থাকলেও বশিষ্ঠের মত উড়নচণ্ডীর খোঁজখবর করে না। বশিষ্ঠের মতিগতি বড় ভাল নয়; ওর খোঁজখবর করা কী চাট্টিখানি কথা? অসম্ভব, সেই সাধনা করার সময় কার আছে শুনি? এদের কারুর সময় নেই বলে বশিষ্ঠ বেঁচে গেছে। সংসারে যারা মাথা হয়ে আছে বা সংসারের পাঁকে যারা খোয়া গেছে-- এদের কারুরই জন্য এক ফোঁটা সময় নষ্ট করতে বশিষ্ঠ রাজি নয়।

স্টুডিও-কাম-আবাসস্থলে একটিমাত্র মানুষ - হরিপদ মাহাতো। সেই পুরুলিয়ার ঝালদা থেকে নাবালক হরিপদ মাহাতো কবে এসে যে বশিষ্ঠের সঙ্গে লেপটে গেছে এখন মনেও পড়ে না। সেই থেকে ছায়ার মত টিকে আছে। হরিপদ মাহাতোকে বশিষ্ঠ পরম আত্মীয়ের সম্মান দেয় বলেই বোধ হয় অর্থের লোভ দেখিয়ে ওকে এখান থেকে কেউ ফুসলে নিতে পারেনি। এও হতে পারে যে হরিপদ বশিষ্ঠকে ভালোবেসে ফেলেছে। হরিপদ থাকাতে বশিষ্ঠের যেটা মস্ত সুবিধে হয়েছে, তা হলবাজার-হাট রান্নাবান্না, বন্ধুবান্ধবদের অভ্যর্থনা--সব হরিপদ একা হাতে সামলায় । সবচেয়ে বড় কথা, প্রয়োজনে রিসেপ্সনিস্টের কাজও করে। বাবুর গতিবিধির হিসাব রাখতে না পারলেও ফোন তুলে জবাব দেয়। --বশিষ্ঠ বাড়িতে আছে? ফোন তুলে হরিপদর স্পষ্ট জবাব--নেই তো । --কোথায় গেছে ?

--জানি না। --অফিসে যায়নি?

--তিনদিন ধরে যাচ্ছে না।

--দিল্লীতে আছে, না বাইরে গেছে?

হরিপদ ভাবে, ফোনে গলাটা চিনতে পারলে তবে না বলা যায়, বাবু কোথায় গেছেন বা যেতে পারেন, যদিও সে হিসাব সে নিজেও বেশির ভাগ সময়ে জানে না। দিল্লী বড়

খারাপ জায়গা। রয়েসয়ে চলতে হয়। বাবু ঠিকই বলেন। তাই এতক্ষণ পরে প্রশ্নকর্তাকে জিজ্ঞেস করে --কে বলছেন? --আমি নীলাদ্রি বলছি, তোমার বাবুর বন্ধু ।

বশিষ্ঠ দিল্লীতে আছে কি নেই বুঝতে না পেরে একই প্রশ্ন করল নীলাদ্রি-- বলছ না কেন, বশিষ্ঠ দিল্লীতে আছে কি অন্য কোথাও গেছে?

--আমি কী জানি, যে বলব? বাবু কোথায় থাকে জানার কি কোন উপায় আছে? এই এখানে আছে দেখলেন, কফি বানিয়ে আনতে আনতে হাওয়া। আজ বাড়িতে আসবে কিনা তাও জানি না।

--হ্যাঁ বুঝেছি। নীলাদ্রির গলায় উষ্মা। টেলিফোন রাখার আগে নির্দেশ দিল--বাবু এলে বোল, নীলাদ্রি গুপ্ত ফোন করেছিল। খুব জরুরী দরকার।

কিন্তু হরিপদ মাহাতো যাকে পছন্দ করে না, তার কথা ঘুণাক্ষরেও বাবুকে বলে না। সুতরাং নীলাদ্রি গুপ্ত যে ফোন করেছিল, 'নিশ্চয় বলব', বললেও সেটা চেপে যায় হরিপদ। তাছাড়া কখনই-বা বলবে? বাবু ইদানীং কি একটা কাজ নিয়ে মেতে আছেন, সারাক্ষণ বই ঘাঁটেন, লেখেন আবার পাগলের মত রঙ তুলি নিয়ে কি সব যেন আঁকেন। বাবু যখন আঁকেন বেশি লোকজনের আসা-যাওয়া পছন্দ করেন না। তখন মুড ভাল থাকে না। এসব ভেবেই হরিপদ চিন্তা করে দেখল, বাবুকে কিছু না বলাই নিরাপদ। কাজের সময় যত কম লোক বিরক্ত করে, ততই মঙ্গল।

একটু আগেও বশিষ্ঠ বাড়িতে ছিল না; এখন ঈজলটায় বিরাট বড় একটা ক্যানভাস লাগিয়ে রঙ-তুলি নিয়ে বসেছে। সারা ঘরে, ঈজলের কাছে রাখা ছোট্ট টেবিলেও নানা রঙের টিউব ছড়ানো। যত না আঁকছে, ভাবছে অনেক বেশী। অ্যাসট্রে উপছে পড়ছে পোড়া

আধ পোড়া সিগারেটের টুকরোয়। মাঝে মাঝেহরিপদর ডাক পড়ছে; সে কফি বানিয়ে আনছে।

বশিষ্ঠ বলে, রাজস্থান নিয়ে যখন একবার কাজে নেমেছি, এবার চুটিয়ে রঙের খেলা খেলব। ক্যানভাসে উঠবে রঙের বর্ণচ্ছটা। লোকে বলে, রাজস্থানের প্রতিটি পাথরের গায়ে কান পাত–শুনতে পাবে তার বীরত্বের বড়াই কিংবা সৌন্দর্যের স্মৃতিচারণ। রাজস্থানের শৌর্যবীর্যের রাজকাহিনি, রাজপরিবারের গল্পকথার চিরকালই বড় বাজারদর; কিছু ডলার ছড়ালে প্রচুর ভাল রিসার্চার পাওয়া যায়। তাছাড়া চারণ কবিরা তো আছেই, তাদের কাজ রাজারাজড়াদের বীরগাথা গেয়ে বেড়ান। তারজন্য তাদের পোষ্য হতে হয়েছে রাজাদের। মানছি যে রাজাদের অন্তর্বিবাদ, দ্বন্দ্বকলহ নানা পর্যায়ের ইতিহাসের মোড় পালটে দিয়েছিল। তা বীরত্ব বা পারস্পরিক বিশ্বাসঘাতকতা হোক-- সব কাহিনির একটা বিশেষ ভঙ্গী আছে, তার নিশ্চয় একটা বিশেষ রঙ আছে। কালচে রক্তরঙের যেন আভাস পাওয়া যায়। সেই একই ইতিহাস না ঘেঁটে সাধারণ মানুষ যারা জীবন সংগ্রামে সাঁতার দিতে গিয়ে রঙ ছড়ায় অহরহ–এই পেইন্টিংগুলিতে বা স্কেচ–এ শুধু তাদের কথাই থাক না। বশিষ্ঠ এবার আঁকবে তাদের--যতটুকু রঙে তারা ধরা পড়ে। রাজস্থানের সাধারণ মানুষ তার জীবন আর কলরব নিয়ে রঙ হয়ে উঠে আসছে। ছোট বড় ক্যানভাসে তাকে ছড়িয়ে দাও। হোক না এবার অন্যরকম কিছু--ক্ষতি কি !

বশিষ্ঠের এই সৃষ্টি অনুপ্রেরণার কোন বিকোন চেহারা নেই। বিদেশে–বিভুঁইয়ে রাজতন্ত্রের বেসাতি করে অর্থসমাগমের পথ করে নেওয়া নয়--সমাজতন্ত্রকে আঁকড়ে ধরে এক ধরণের নস্টালজিয়ায় ভোগার আত্মবিলাসও এটা নয়। আসলে বর্তমান ভারতবর্ষের পটে রাজস্থান এমন একটা রাজ্য-- যেখানে সূর্যের সাতরঙ নিয়ে রঙ্গরসে মেতে ওঠা যায়। সব মাঠেই খেলা জমে কিন্তু কলকাতার ইডেন গার্ডেনে খেলাটি যেন বেশি জমে ওঠে। যেমন খেলা যায় লালের চেয়ে নীল রঙে বেশি, বেগুনির চেয়ে হলুদে।

সব রঙেরই আলাদা বাহার কিন্তু বশিষ্ঠের কাছে হলুদের যেন আলাদা মাধুর্য। রাজস্থানের সারা অঙ্গে যেন শতরঙের ছড়াছড়ি--এ যেন রঙের অর্কেস্ট্রা। রাজস্থানী মেয়েদের–বউদের ঘাগরা লেহেঙ্গার কী বর্ণবৈচিত্র্য--রঙে রঙে যেন চোখে নেশা ধরে। সাদা চোলী ওখানে চলে না--তার গায়েও রঙ চাই। তেমনি রাজস্থানী পুরুষের পাগড়ি বাঁধার ধরণ দেখে যেমন জাতবিচার হয় সেই পাগড়ির কি রঙবাহার। কিন্তু যে ঝুরঝুরে বালির ওপরে রাজস্থান দাঁড়িয়ে, তার রঙ কী হরিদ্রাভ নয়? যত রঙ নিয়েই তুমি খেল, রাজস্থানে হলুদ ফুটে উঠবেই। যত রঙ তুমি লাগাও, হলুদ রঙের ওয়াশ তোমাকে দিতেই হবে। তবেই তানপুরার চার তারের সুর থেকে একটাই সুর বেরোবে। বিয়ের অনুষ্ঠানে

রাজস্থানী পুরোহিত কুষ্ঠিবিচার করে বিয়ের লগ্ন ঠিক করে; কুমকুম পত্রিকায় হলুদ রঙ মেখে তাতে সিঁদুরের স্বস্তিক চিহ্ন এঁকে দিলে তবেহয় একটি ঘাগরার সঙ্গে বাহারী পাগড়ির মিলন । ক্যানভাসের গোটা জমিটা হলুদ প্রলেপে ভরে দাও। তারপর চড়াও অন্য রঙ। জয়সলমের-এর ছবিটাই আগে মনে পড়ে। হলুদ জমির আশেপাশে লাল ঘাগরা, সবুজ চোলী আর নীল ওড়না উঠিয়ে মাথায় কলসীর ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে ভীল মেয়ে। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছোট ছোট লাল নীল রঙের কাপড়ে এপ্লিকের কাজ করা গোবন্ধ পিঠে ঝুলিয়ে হলুদ উট। উটের পিঠে বসেছে শৌর্যবীর্যের প্রতিনিধি এক রাজপুত্র; ও কি চলেছে আর এক হলুদসনা সঙ্গিনীর সন্ধানে ?

ভীল মেয়ের স্নিগ্ধ শরীরে হলুদ রঙটা যেন বেশি মানায়। রক্তচক্ষু ভীল সুশোভিত ভীল রমণীকে আড়াল করতে গিয়ে কত যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে। কিন্তু এদেশীয় কোন সফোক্লিস সেই ট্র্যাজেডি নাটকে রূপায়িত করে তোলেন নি। তাই ওসব কাহিনি হয়ত কেউ জানেই না।

বেড়াতে বেরিয়ে টুরিস্ট বা পি.ডবলিউ.ডি. বাংলোতে কদাচ ওঠে না বশিষ্ঠ। ও এমন লোকের সঙ্গ চায় যার আচার-ব্যবহারে, জামাকাপড়ে এমন কি গায়ের গন্ধে, সেই জায়গাটা কথা বলে উঠবে। একবার পোকরাণ গিয়ে উঠেছিল ভাটিয়া কী সরাইখানায়। সেটা পাঁচ বা তিন-তারা হোটেলের যুগ নয়। ১৯৬১ সালের কথা। সরকারী উদ্যোগে মরুমহোৎসব শুরু হবার অনেক বছর আগের কথা। তখন ভরসা বলতে ঐ ভাটিয়া কী সরাই-ই ছিল। রাস্তা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যাও। গুহার মত সব ঘর। আদিম মানুষের মত যেন থাকা-খাওয়া। জল চাইলেই পাবে--সামনে পাতকুয়া ।

পোকরাণ স্টেশন থেকে বেরিয়ে বাঁদিকে আট দশটা দোকান; তার ভেতরে একটি ভাটিখানা। পাশেই গরমাগরম পুরী-তরকারী আর ভাজাভুজি পাকোড়ার দোকান। ওখানে বশিষ্ঠ একজন ভোপার সান্নিধ্যে এসেছিল। গৃহী কিন্তু যোগীর মত থাকে। গান গেয়ে বেড়ায় আবার লোকের চিকিৎসাআত্তিও করে। কাঁচাপাকা দাড়ি চিবুকের দু'পাশে ভাগ করে কানের পেছনে জড়ানো। গভীর চোখ, সরল হাসি। লোকটা ভাটিখানার ভেতরে ভূগর্ভে গোল মতন একটা জায়গায় পড়ে থাকত। তখন গরমকাল হলেও মাটির নিচের আস্তানা বলেই বোধ হয় অতটা তেতেপুড়ে উঠত না। তিন চারদিন আড্ডা দিয়ে কেটে গেল। রোজ সন্ধ্যায় এক এক দেশী খাওয়া হতো। মাঝে মধ্যে জাফরাণ দিয়ে তৈরী হাজার হাজার গোলাপের পাপড়ির নির্যাসে সুগন্ধিত 'আশা' --যা রাজারাজড়াদেরই সখের মদিরা। সঙ্গে চলত শিকার করা মাংস।

বশিষ্ঠের মনে পড়ে গেল সেবার পোকরাণ যাবার পথে ট্রেনে সে কি ভিড়। মানুষগুলি সব যেন বোঁচকা হয়ে গেছে। নীচে বসার এক ফোঁটা জায়গা নেই; বাঙ্কে উঠে বসেছে। এরমধ্যে এইয়্যা বড় গোঁফ, মাথায় পাট করে বাঁধা রঙিন পাগড়ি, জোয়ান-তাগড়া একজন রাজপুত একটি পুঁটলি বগলদাবা করে উঠল। রাজপুতদেরপাগড়ি বাঁধার কায়দাটাই আলাদা। বড় বড় চোখ মেলে ভ্রু উচিয়ে একবার চারদিকে দেখে প্রায় জবরদস্তি করেই পুঁটলিটা কোলে নিয়ে বসল। পুঁটলির ফাঁকে বশিষ্ঠ দেখে জলজ্যান্ড একটা মেয়ে। বউটা ঘোমটা দিয়ে দিব্যি বসে আছে। বিস্মিত হল বশিষ্ঠ; স্বপ্নেও ভাবেনি এরকম একটা অভাবনীয় দৃশ্য দেখবে। রাতে রাজপুত যখন ঘুমে বিভোর, তখন বাচ্চা মেয়েটা আর ঘোমটা ঠিক রাখতে পারেনি। ছোট্ট মেয়ের অত কি আর খেয়াল থাকে! হোক না বিবাহিত।

জয়সলমের-এর একটা রাস্তা বশিষ্ঠকে আজ বড় টানছে। যে পথ দিয়ে প্রাচীনকালে বাণিজ্যের লেনদেন হত। সোজা একটা রেখা টানলেই এখনকার পাকিস্তানের সিন্ধ। জয়সলমের-এর পশ্চিমে ঐ পথেই আগে পড়ত অমরকোট-সম্রাট আকবরের যেখানে জন্ম হয়েছিল। পাকিস্তানের মানচিত্রে ওটা আছে বলে এখান থেকে জায়গাটাকে তাক করা মুশকিল। এই পথেই লোকেরা উটের ক্যারাভানে দিব্যি আনাগোনা করত। রাস্তা এই আছে, এই নেই--বালিতে ঢাকা পড়ে। আবার দমকা হাওয়ায় সরীসৃপের মত লিকলিকে ধূসর রঙের রাস্তাটা বেড়িয়ে পড়ে। শস্যহীন, বৃক্ষহীন সোনালী বালিতে ভরা ধূ ধু প্রান্তর। পথে বালির ঝড় উঠলে মৃত্যু। প্রচণ্ড বেগে বালি উড়ছে, মুহূর্তে সেটা বালির পাহাড়; আবার হাওয়ায় বালি সরে গেল। অন্যদিকে তখন মরুভূমির কদর্য মুখটা বেরিয়ে পড়েছে; বালির পাহাড়ে গোর-দেওয়া উটের বা মানুষের কঙ্কাল।

জয়সলমের-এর সেই রাস্তায় মাঝে মাঝে রক্তগঙ্গা বয়ে যেত। চন্দ্রবংশের বংশধরেরা পাতলা কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে প্রতীক্ষায় থাকত কখন চন্দ্রালোকিত আকাশটা মেঘাবৃত হয়, কখন কালো মেঘের কালো পর্দা ক্যারাভানের ওপর এসে পড়ে। তখন তারা ঘোড়া ছুটিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত ক্যারাভানের ওপর। লাল রঙের বিনিময়ে হয়ত বিপ্লব ঘটান যায়--এরা করত শুধু লুটপাট। কিই-বা করে, জমি নেই যে চাষ করবে, শস্য ফলাবে, জল নেই যে তৃষ্ণা মেটাবে, ঐশ্বর্য নেই যে প্রাসাদের অন্তঃপুরে আশ্রয় নেবে। পড়শি রাজ্যগুলির ওপর মাঝে মাঝে ঝাঁপিয়ে না পড়লে তাই, পেট চালানই তো দায়। মারো আর খাও। কেই-বা করছে না সেটা? সারা পৃথিবীর এই তো ইতিহাস। তবে মারটা মোটা দাগের ঘটত মেঘাবৃত রাতের অন্ধকারে। এদের ডাকাতি বরং ভালই ছিল, মানুষকে শোষণ করে আস্তে আস্তে নিংড়ে নেবার চেয়ে বরং এটা ভাল। তবে ইংরেজ আমলে এসে নিয়মটা ছিল লুটপাট কর ক্ষতি নেই কিন্তু পুলিশ কমিশনারের ক্যারাভানে যদি হাত দাও, তোমাকে শাস্তি পেতেই হবে।

আজকাল টাকা রোজগারের আর এক ধান্দা হল অবসর সময়ে কে কত বড় লম্বা গোঁফ রাখতে পারে--লম্বা গোঁফ কুণ্ডলী পাকিয়ে গালের দু'পাশে সাজিয়ে রাখ। টুরিস্টের কাছে গোঁফ দেখিয়েই ত্রিশ টাকা লাভ। একটা ছবির দাম পাঁচ হাজারটাকা, কম কথা! ন্যাশানাল জিওগ্রাফি ম্যাগাজিনে গোঁফের ছবি বেরিয়েছিল। আবার রাতের অন্ধকারে বাঁশীও বাজাত চমৎকার। রাতে বাঁশী বাজিয়ে পয়সা, দিনে গোঁফ দেখিয়ে পয়সা--কে আর তবে কাজ করতে চায়?

কিন্তু ইতিহাস বলে জয়সলমের দুর্গ গড়েছিল ভাট্টি রাজপুত বংশের রাবল জয়সাল ১১৫৬ খৃষ্টাব্দে। এ পথে সেই বীভৎস কাণ্ডটা ঘটে ১২৮৭ সালে। সেবার আলাউদ্দিন খিলজীর ক্যারাভানটা আসছিল। জ্যোৎস্না রাত। হঠাৎ কোথা থেকে আকাশটা মেঘে ঢেকে গেল। এই সুযোগেরই অপেক্ষা করছিল ভাট্টি লুটেরা।

এই লুটের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল গোটা ভাট্টি রাজবংশকে। আলাউদ্দিনের সৈন্যরা জয়সল দুর্গকে আট বছর ঘিরে রেখেছিল। সেই যুদ্ধে ২৪ হাজার যোদ্ধা প্রাণ দেয়--বহু নারী জহর করে জ্বলে মরে। আর ১৩৭০ সালে ওরকম লুঠ করতে গিয়ে আর একবার তারা বিপদে পড়েছিল। ফিরোজশাহ তুঘলকের কাছে ভাট্টিরা অঙ্গীকার করতে বাধ্য হয় যে, কাপুরুষের মত এ ধরনের আক্রমণ আর কখনও করবে না--তাতে এরা খেতে পাক বা না পাক। শেরশাহের তাড়া খেয়ে অমরকোটে পালাবার সময়ে এই পথটাতেই হুমায়ুনের সৈন্যরা তৃষ্ণায় বুক ফেটে মরেছিল। ঐ পথে এক একটা কুয়োর গভীরতা একশো পুরুষের মত; কখনও-বা ছশো পুরুষের গভীরে। শোনা যায় কুয়ো যখন পাওয়া

গিয়েছিল, তৃষ্ণার্ত সৈন্যরা জল খেতে গিয়ে পাগলের মত কুয়োর মধ্যেই ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল। অত গভীর কুয়ো থেকে জল তুলতে সময় লাগে; তর সইল না। হুমায়ুনের বেগম এই দুর্ধর্ষ পথযাত্রা কোনমতে পেরোতে পেরেছিলেন বলেই অমরকোটে আকবরের জন্ম হতে পেরেছিল।

সেটা অন্য ইতিহাস। বশিষ্ঠ জানে না ঐ পথটাই ওকে এত টানছে কেন! সারা ক্যানভাস জুড়ে কি সেই পথটাকেই ফোটাবে--যে পথে বালির ঝড়ে পথিক পথ হারায়, যে পথে তৃষ্ণায় দেখে মরীচিকা! অবশেষে কুয়োর কাছে গিয়ে যখন পৌঁছয়, জল তোলার ধৈর্য থাকে না, পাগলের মত ঝাঁপ দিয়ে বুকের তৃষ্ণা মেটাতে চায়? বশিষ্ঠ বালির ঝড় আঁকল--মেঘের আড়ালে যেটুকু আলো, তাতে দেখা যাচ্ছে ঘোড়ার পিঠে বসে আছে কিছু কালো কালো মানুষ। ঐ কালো কালো মানুষগুলোই কি ঘোমটা-টানা রূপসীকে ক্যারাভান থেকে রাতের অন্ধকারে ছিনিয়ে নিয়েছিল? প্রতি রাতে এরা অপেক্ষা করে থাকে। রূপ কী ক্ষিদে মেটায়? ক্ষিদের জ্বালায় সব যে ভুল হয়ে যায়। কাউকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। বশিষ্ঠ তন্ময় হয়ে এঁকে যেতে থাকল ।

এর পর আগামী সংখ্যায়

সরস্বতী ও শ্রীপঞ্চমী (প্রথম পর্ব)

আদিত্য ঠাকুর

সরস্বতী পূজা ও শ্রীপঞ্চমী সমার্থক আজকের প্রেক্ষিতে। দেবী সরস্বতী এক শক্তি। সনাতনবাদীরা নিরাকার শক্তির সঙ্গে সাকার শক্তির আরাধনাও করতেন।

ঋগ্বেদে সরস্বতীর উল্লেখ আছে দু'ভাবে, মর্তে সরস্বতী একটি নদী। স্বর্গের সরস্বতীও নদী। তবে তা স্বর্গীয়, তারায় ভরা এক শুভ্র প্রশস্ত আলোক সরণি। শুভ্র জ্যোতির্ময়ী এই দিব্য নদী বহু নামে ভূষিতা। আমরা পরিচিত জানা বস্তুর সাদৃশ্য দেখে অচেনা কিছুর নামকরণ করে থাকি। রাতের আকাশে তারার সন্নিবেশ বা সজ্জা দেখে বলি, যেন যোদ্ধা, পাখি, সাপ, বিছা, নৌকা বা মাছ ইত্যাদি। সময়ের সাথে "যেন" শব্দটি লুপ্ত হয়ে যোদ্ধা, পাখি, সাপ, বিছা, নৌকা, মাছ নাম থেকে যায়। আকাশের শুভ্র জ্যোতির্ময়ী আলোক ধারা এভাবেই দিব্য বা স্বর্গীয় সরস্বতী নামে ভূষিত হয়েছে। আরও বহু নামে আমরা তার পরিচয় পাই, যেমন পুরাণে বলা হয়েছে সুরগঙ্গা, মন্দাকিনী। ফাল্গুন মাসের প্রথম দিকে সান্ধ্য আকাশে মহাকাল বা কালপুরুষের মাথার ওপর দিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে বহে যেতে দেখা যায় সুরগঙ্গাকে। এই জন্য মহাকাল হয়েছেন গঙ্গাধর আর সুরগঙ্গা হয়েছে শিবগঙ্গা। ছায়া শব্দের অর্থ

দীপ্তি, তাই কালিদাস তাঁর কাব্যে দিব্য সরস্বতীকে বলেছেন ছায়াপথ। এক শুভ্র দীপ্তিমতী নদী নভোমণ্ডলকে বলয়াকারে বেষ্টন করে রেখেছে।

(চিত্র ১ : কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডল ও ছায়াপথ)

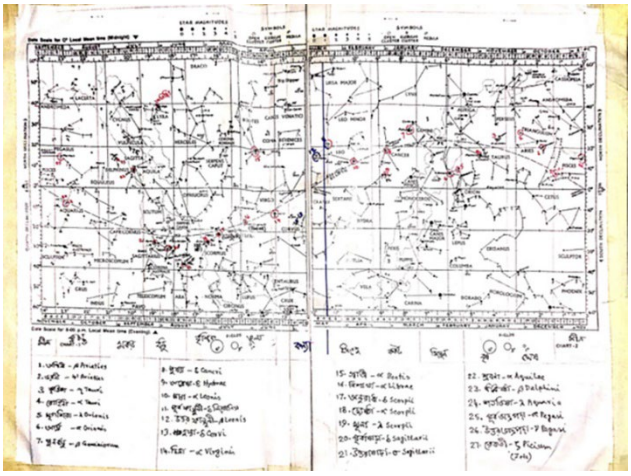

চিত্র ২ : সম্পূর্ণ আকাশের মানচিত্র। ভাঙ্গা রেখা দ্বারা ঘেরা ছায়াপথ, বিভিন্ন তারামণ্ডল ও নক্ষত্র চক্রে বিভিন্ন তারার অবস্থান দেখা যাচ্ছে।

নক্ষত্রচক্র বা রাশিচক্রকেই পুরাণে এবং বেদে স্বর্গ বলা হয়েছে। (আকাশের মানচিত্র দ্রষ্টব্য)

বছরের বিভিন্ন সময়ে সুরগঙ্গা বা ছায়াপথকে আকাশে বিভিন্ন আকারে দেখা যায়। আশ্বিন মাসের গোড়ার সান্ধ্য আকাশে সুরগঙ্গা ছিন্নবিচ্ছিন্ন। ঋগ্বেদের ঋষিরা সেই যুগে মাথার ওপর শ্যেন পাখী সদৃশ নক্ষত্র মণ্ডলের মাঝে শ্রবণা তারকাকে দেখতেন শাখাযুক্ত ছায়াপথের প্রেক্ষাপটে। শ্রবণা নক্ষত্রের অধিপতি বিষ্ণু। সেই কারণে আকাশের এই স্থানের সুরগঙ্গার নাম হয়েছে বিষ্ণুগঙ্গা।

এভাবেই দিব্য সরস্বতী, যা আজ আমরা আকাশগঙ্গা বা ছায়াপথ বলে জানি, স্থান-কালের প্রেক্ষিতে তা বিভিন্ন নামে নামাঙ্কিত হয়েছে। সরস্বতী নামের ব্যুৎপত্তি, “যাতে সরস্ জল আছে” । বেদে আলোকে বলা হয়েছে স্বর্গীয় জল, আবার বেদেরই কোথাও আলোই অমৃতও। তাই দিব্য সরস্বতীর আলোক ধারাই অমৃত।

দিব্য সরস্বতীর এমনই আর একটি নাম ক্ষীরাব্ধী। ক্ষীর অর্থে দুধ অর্থাৎ শুভ্র, অব্ধি অর্থে সাগর। দেব-অসুররা একবার এই ক্ষীরাব্ধী মন্থন করেন। সেই সাগর থেকে আবির্ভূতা হয়েছিলেন দেবী লক্ষী। অর্থাৎ লক্ষ্মী এবং সরস্বতী উভয়ই ছায়াপথের অংশ এবং ছায়াপথ থেকে উদ্ভুতা। সুতরাং ছায়াপথের ভিন্ন দুটি অংশের বা স্থানিক পার্থক্য ছাড়া দেবী সরস্বতী ও দেবী লক্ষ্মীর অভিন্নতাই দেখা যাচ্ছে। অমৃত (আকাশ গঙ্গার আলোক) থেকেই দেবীর উৎপত্তি।

ধর্মকৃত্যের নিয়ামক তিনটি : শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ। শ্রুতি হল বেদ। স্মৃতি হল স্মরণ, প্রাচীন কালের ধর্মকৃত্যের ব্যবস্থা স্মরণ। প্রাচীনকালে বছরের কোন্ ঋতুতে কোন্ মাসে কোন্ তিথিতে কী কৃত্য ছিল, কোন অনুষ্ঠান হত, তার স্মরণ। আগে যেমন হত, এখনও তেমনই হবে, স্মৃতি পরম্পরা ভঙ্গ হবে না। পুরাণে আগেকার ঐতিহ্য লেখা হয়েছে। এই কারণে স্মার্তরা দেব-দেবীর পূজা বিষয়ে পুরাণে আশ্রয় করেছেন।

এর পর আগামী সংখ্যায়

লেখা ১০

ফিরে দেখা (প্রথম পর্ব)

প্রদীপ শ্রীবাস্তব

প্রাককথন :

আমি জন্মসূত্রে কলকাতার বাসিন্দা। আমাদের পূর্বপুরুষ বহুদিন আগেই নিজভূম ছেড়ে কলকাতাবাসী। ফলে, আমি জন্ম থেকেই কলকাতার বুকে বেড়ে ওঠা, এখানকার কৃষ্টি-কালচারের সাথে মিশে, বাংলা মিডিয়াম স্কুলে পড়া একজন বাঙালি।

বাবা দক্ষিণ ভারতীয় হলেও, মা ছিলেন বাঙালি মহিলা।

বাবা ছিলেন ব্যবসায়ী। সপ্তাহে একদিন দোকান বন্ধের দিনে বাবা-মা সেদিন কোনও ভালো সিনেমা অথবা উত্তর কলকাতার থিয়েটার পাড়ায় থিয়েটার দেখতে যেতেন নিয়ম করে।

সাথে প্রবল নাছোড়বান্দা আমি।

সেইই আমার সিনেমা-থিয়েটার দেখার হাতে খড়ি।

<u>আদি পর্ব :</u>

যদিও এই লেখার সময়কাল বলেছি যে, ৭০- ৮০-৯০এর দশক। তবুও আমার জন্মকাল যেহেতু ৫০ এর দশকের একেবারে শেষভাগে, সেহেতু আমি ৬০ এর দশকে আমার ছোটবেলার দেখা সিনেমা বা চলচ্চিত্র সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয় ছুঁয়ে যাচ্ছি।

সিনেমাহলে গিয়ে আমার প্রথম দেখা, মায়ের হাত ধরে বেহালার ' অজন্তা ' সিনেমা হলে সাদা-কালো ছবি " বদ্রিনাথ যাত্রা "।

তখন আমার বয়েস মাত্র ৬-৭। অতএব কয়েকটি খন্ড দৃশ্য মনে রাখা ছাড়া স্মৃতির পাতা বেশ ধূসর।

সেসময়ে বেহালায় সিনেমা হল ছিল যথাক্রমে, ' সুচিত্রা, অজন্তা, অশোকা এবং পুষ্পশ্রী '।

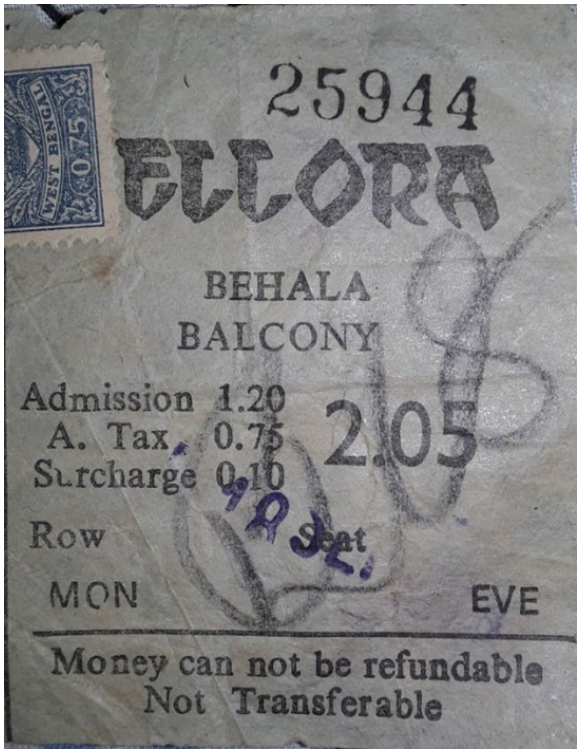

পরে বেহালার প্রখ্যাত রায় পরিবারের তরফ থেকে ' ইলোরা ' নামে আরেকটি সিনেমা হল এর উদ্বোধন হয়। এবং, তারও পরে ' পিয়াসী '।

আর, এই ' পিয়াসী ' সিনেমা হল নিয়ে এখানে কিছু বলার আছে। বেহালার বুকে এই হল বহু পুরাতন হলেও কিন্তু, এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা সাধারণ মানুষ একেবারেই অজ্ঞাত ছিলাম। তার কারণ, এই হল তৈরি হয়েছিল তখনকার প্রখ্যাত বাঙালি প্রতিষ্ঠান ' জলযোগ ' কেক-পেস্ট্রি-প্যাটিস এর মালিকের ব্যক্তিগত পারিবারিক হল হিসেবে।

এবং চমকপ্রদ তথ্য হচ্ছে (প্রখ্যাত কার্টুনিস্ট চন্ডী লাহিড়ীর ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ থেকে), এই হলের নামকরণ করেছিলেন স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জলযোগ এর আমন্ত্রণে বেহালায় দ্বিতীয়বার পদধূলি দিয়ে।

অনেক পরে এই হল সাধারণ জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় বাণিজ্যিক সিনেমা হল হিসেবে। বর্তমানে এই ঐতিহাসিক রবীন্দ্র স্মৃতিবিজড়িত হলটি প্রমোটার নামক হাঙরের হাতে পড়ে সুউচ্চ বহুতল আবাসন গড়ে ওঠে।

এখানে আরেকটি কথা বলে রাখি যে, যেহেতু আমার শৈশব থেকে বেড়ে ওঠা বেহালা অঞ্চলে, সেহেতু সিনেমা হল এবং তৎসংক্রান্ত লেখা আমি প্রথমেই বেহাল থেকে শুরু করলাম।

এবং, পরবর্তীকালে আমার কলেজ জীবন কেটেছে প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডের ' যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজ ' এ, ; সে কারণে বেহালার পরেই আমি টালিগঞ্জ-রাণীকুঠি-নাকতলা-গড়িয়া এলাকার সিনেমা হলের কথা ক্রমান্বয়ে আলোচনা করব।

এর পর আগামী সংখ্যায়

লেখা ১১

রোমাঞ্চে ঘেরা ইতিহাসের পথে (প্রথম পর্ব)

বাবলু সাহা

আগের ধারাবাহিকে পাহাড়কে কেন্দ্র করে অ্যাডভেঞ্চারের সত্যি গল্প লিখেছিলাম।

তো এবারে ভাবলাম পাহাড়ের বদলে সমুদ্র নিয়ে কিছু রোমাঞ্চকর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা লিখি। যদিও আমি একান্তই একজন পর্বত বা হিমালয়প্রেমী, তবুও একটু অন্যরকম নতুন কিছু রোমাঞ্চের খোঁজে ঘরের নিকটেই কয়েকটি অজানা-অচেনা নির্জন সী বীচের সন্ধান পেলেই তৎক্ষণাৎ সেখানে পাড়ি জমিয়েছি। এও একরকম ভালোবাসার আবিষ্কার বৈ কী !

একটি বিতর্ক কিন্তু আবহমানকাল ধরে চলে আসছে, কোনটি বেশি পছন্দের জায়গা, সমুদ্র না কী পাহাড় ?

ধৃষ্টতা মাফ করবেন, এ প্রসঙ্গে আমার ব্যক্তিগত জীবনের একটি অভিজ্ঞতার কথা দিয়েই শুরু করি।

আমি তখনও সেভাবে ট্রেকই শুরু করিনি, তবে খুবই হিমালয়ের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে ভীষণই ভালোবাসতাম। ল্যান্ডস্কেপ ফটোগ্রাফীর খুব নেশা ছিল। সেইসময় একজন সুপুরুষ লম্বা-চওড়া মানুষ ঢুকলেন আমার সেই দোকান থেকে কিছু জিনিস কিনতে।

এরপর উনি যখন তার পেমেন্ট করছেন, সেসব ভালোলাগার ছবি ১০×১২ সাইজে ল্যামিনেশান করে আমার দোকানের চারিদিকে সাজিয়ে রাখতাম। তো, একদিন একাই বসে আছি কাউন্টারে ; তখন আমার দিকে চেয়ে হঠাৎই প্রশ্ন করলেন, — খুব ঘুরতে ভালোবাসেন ? ' আমি উত্তর দিলাম যে " হ্যাঁ অবশ্যই " সেটি শুনেই পরক্ষণেই ওনার প্রশ্ন পাহাড় না কী সমুদ্র ? ' আমার উত্তর " অতি অবশ্যই পাহাড় সঙ্গে সঙ্গে ওনার বিশাল চওড়া হাত বাড়িয়ে আমার (ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন কেন) সাথে আন্তরিকভাবে করমর্দন করে উনি বললেন 'ভেরি গুড ; সমুদ্র হচ্ছে আসলে মানসিকভাবে হতাশাবাদীদের। কারণ, সেখানে কোনও রকম বৈচিত্র্য নেই, একই ঢেউ বারবার যায় আসে। একই ঢেউ বারবার যায় আসে। সেসব কল্পনাবিলাসীদের জন্য। আর, পাহাড় হচ্ছে উচ্চাশিদের জন্য। তার পথ চলায় বাঁকে-বাঁকে সৌন্দর্যের হাতছানি। নতুন-নতুন আবিষ্কারের আনন্দ। এবং, প্রত্যেকটি পাহাড়চূড়া (হিমালয়) প্রত্যেকটির চেয়ে আলাদা। সেখানে মাটির কাছাকাছি থাকা হিমালয়ের হরেক বৈচিত্র্যময় মানুষ-ফুল-পাখি-বন-জঙ্গল ইঃ শরীরে নতুন প্রাণের সঞ্চার করে। আর, এরপর থেকে আপনি গাড়িতে না ঘুরে, পায়ে হেঁটে ভ্রামণ করবেন। ' ও হ্যাঁ, বলতে / লিখতে ভুলেই গিয়েছিলাম যে, উনি ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল।

যাই হোক, এবারে শুরু করি ঘরের কাছেই কয়েকটি অচেনা-অজানা সী বীচকে কেন্দ্র করে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। এর শুরুটা হয়েছিল একেবারে আচমকাই।

প্রথম পর্বের যাত্রার প্রস্তুতি এবং গমন :

পলাশ রায়ের সাথে আমার প্রথম বন্ধুত্ব এবং আলাপ হয়েছিল ফেসবুকের বন্ধুত্বের মাধ্যমে। এরপর ও আমাকে আমার ঘরে এসে মুখোমুখি সাক্ষাৎ এর জন্য আহ্বান জানায়। আমি সাথে সাথেই রাজী হয়ে যেতেই, একটি দিন ঠিক করে ও আমার ঘরে চলে আসে।

সেদিনই মাত্র কয়েকঘন্টার আলোচনায় মুখোমুখি বসে ঠিক হয় যে, আগামী ৩দিনের মধ্যেই এক ভোরবেলায় ওর বাইক যাত্রার সাথী হয়ে দু-দিনের জন্য কোনও স্বল্পচেনা অজানা জায়গায় পাড়ি দেবার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ার। সেইমত তিনদিন পরেই সমস্ত প্ল্যান ঠিক করে ও খুব ভোরবেলায় বাইক নিয়ে হাজির আমার ঘরে। সাথে একটি মাঝারি রুকস্যাক এবং দুটি ক্যারি ম্যাট্রেস।

ও ঘরে ঢুকতেই আমাদের আগামী দুদিনের বাঁধা-ছাঁদা শুরু হয়ে গেল। সেটি ছিল আগস্ট মাস। তার আগে টানা দু-তিনদিন বৃষ্টি চলেছে। ফলে বর্ষাতিও সাথে নিতে হয়েছিল।

আমাদের প্রথম মূল গন্তব্য ছিল পূর্ব মেদিনীপুরের ' জেলিংহ্যাম ' বন্দর। যেখান থেকে একদা স্যার রাজা রামমোহন রায় প্রথম বিদেশযাত্রা করেছিলেন।

এই জায়গা সম্বন্ধে আমরা গুগল খুঁজেও নাম শুনিনি বা কোনও রকম সন্ধান সূত্র পাইনি। শুধুমাত্র একজনের মুখে খানিকটা আভাস পেয়েই আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।

এর পর আগামী সংখ্যায়

লেখা ১২

বাংলার দ্বিতীয় সিনেমা হলও ভাঙ্গা পড়ল

চণ্ডী মুখোপাধ্যায়

বাংলায় প্রথম সিনেমা ব্যবসায় নামেন জামসেদজী ফ্রামজি ম্যাডান। তাঁবু ফেলে সিনেমা দেখাতেন তিনি। ময়দানে পাকা তাঁবু সিনেমাও তৈরি করেন তিনি। সেখানে নিয়মিত বিদেশ থেকে সিনেমা এনে দেখানো হত। কিন্তু দূরদর্শী ম্যাডান বুঝলেন এইরকম ভাবে চললে এই ব্যবসা বেশীদুর টেনে নিয়ে যাবে না । পাকা সিনেমা হল দরকার আর দরকার সিনেমা নির্মাণ। দুটো পরিকল্পনা সার্থক করতেই নেমে পড়লেন । কলকাতায় হলিউড মডেলে নির্মাণ করলেন সিনেমা হল।

জে এফ ম্যাডানই বাংলায় প্রথম সিনেমা হল তৈরি করলেন। করপোরেশন অফিসের সামনে ছিল এক থিয়েটার হল। সেখানে অনিয়মিত অভিনয় হত। মালিক ছিলেন এক সাহেব। সেই সাহেবের কাছ থেকে হলটা কিনে নিলেন ম্যাডান। ভাঙ্গাচোরা থিয়েটার হাউসটিকে নতুন করে সিনেমা দেখানোর মতো করে তৈরি করলেন। বিদেশ থেকে এল প্রজেকটার মেসিন। লাগল স্ক্রিন। সিনেমা হলের জন্য যা যা দরকার করলেন সেইসব আনুষঙ্গিক বন্দোবস্ত । বাংলা তথা ভারতের প্রথম সিনেমা হলের মালিক হলেন ম্যাডান। তাঁবুর স্মৃতি মাথায় রেখে এই প্রেক্ষাগৃহের নাম দিলেন এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেস।

এই ম্যাডানই তৈরি করলেন বাংলায় দ্বিতীয় সিনেমা হল। এলফিনস্টোন এর পর এখনকার সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি রোডে আরেকটি সিনেমা প্রেক্ষাগৃহ খোলেন ম্যাডান। এখানেও একটা পরিত্যক্ত থিয়েটার হল ছিল। সেটাকেই কিনে নিয়ে সিনেমা হলে রূপান্তরিত করেন তিনি। নাম দেন ভ্যারাইটি পিকচার প্যালেস। এখানেও নিয়মিত ইংরেজি ছবি দেখানো শুরু হয়। ম্যাডান যতদিন বেঁচে ছিলেন তত দিন রম রম করে চলে ভ্যারাইটি পিকচারস প্যালেস। ১৯৩০ সালে এই প্রেক্ষাগৃহ কিনে নেন বোম্বাইএর এক সিনেমা কোম্পানি। নাম হয় 'এলিট' সিনেমা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আবার এলিট সিনেমা বন্ধ হয়। তবে কিছুদিনের মধ্যেই অবশ্য আবার নতুন চেহারায় আত্মপ্রকাশ করে। সেই থেকে আজ অবধি এলিট সিনেমা টিকে আছে। এসপ্লানেড অঞ্চলের সিনেমা পাড়ার এখন একমাত্র অতীতের সাক্ষী এই 'এলিট' । অথচ এই এসপ্লানেড অঞ্চল ছিল বিদেশী সিনেমার স্বর্গরাজ্য। চারিদিকে অসংখ্য সিনেমা প্রেক্ষাগৃহ । গ্লোব, টাইগার, লাইটহাউস, নিউএম্পায়ার, রক্সি, রিগ্যাল, অপেরা, নিউ সিনেমা, সোসাইটি, প্যারাডাইস, জনতা , ম্যাজেস্টিক, মেট্রো এই রকম অনেক প্রেক্ষাগৃহ। কিন্তু এই সিনেমা পাড়া চলচ্চিত্র রেফারেন্সে আজ শ্মশান। সবেধন নীলমণি ছিল শুধু 'এলিট' ।

সেটাও এবার ভাঙ্গা পড়ল।

অন্য জগৎ

নিজস্ব প্রতিবেদন

সম্প্রতি লন্ডনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ‘বাংলা স্ট্রিট’ -এর সম্পাদক আশিস পণ্ডিত বর্ষীয়ান প্রখ্যাত চিকিৎসক ও সাহিত্যিক ডা অঞ্জনলাল দত্তের অনুবাদে রবীন্দ্রনাথের গানের ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থ ‘Theme of Devotion’ তুলে দিলেন পত্রিকার লন্ডন প্রতিনিধি মি এ কে এস মাসুদের হাতে। কিছুদিন আগে শেষ হওয়া কলকাতা বইমেলায় এস বি আই অডিটোরিয়ামে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের গানের এই ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থ তুলে দেওয়া হয় বিশিষ্ট জনেদের হাতে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অর্থ , ভূমি, উদ্বাস্তু ও পুনর্বাসন এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা।অসামান্য এই গ্রন্থে ডা দত্ত রবীন্দ্রনাথের গানগুলির ইংরেজি অনুবাদকে গীতযোগ্য করে হাজির করায় গ্রন্থটি বিশিষ্ট জনেদের আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠেছে।

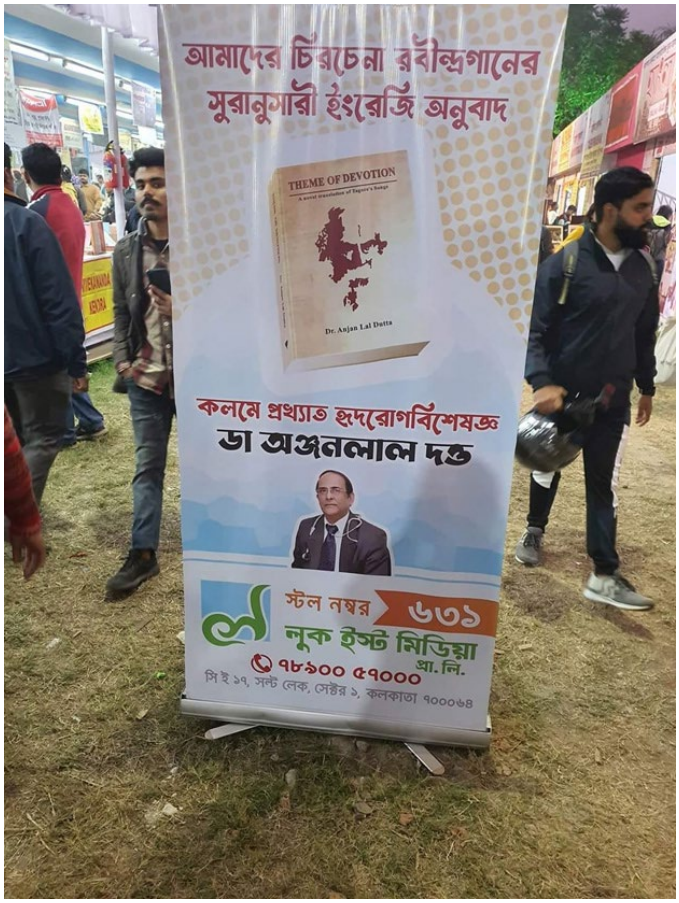

সম্প্রতি কলেজ স্ট্রিটে অভিযান বুক ক্যাফেতে বর্ষীয়ান প্রবাসী সাহিত্যিক ডক্টর অর্ভিন ঘোষকে সংবর্ধনা দেওয়া হল ‘বইওয়ালা প্রকাশনা'র পক্ষ থেকে । শুধু মাত্র বাংলা ভাষা এবং কলকাতায় বন্ধুদের টানে সুদূর আমেরিকা থেকে ৮৭ বছর বয়সে ছুটে এসেছেন তিনি। অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিক মোড়ক উন্মোচন হয় চণ্ডী মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধগ্রন্থ ‘গোদারের নায়িকারা’ এবং পার্থ

মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধগ্রন্থ ‘গোদার ও তাঁর সময়’ , সোমনাথ সাউ-এর কাব্যগ্রন্থ ‘বদলে যাওয়া পৃথিবী’ -র। উপস্থিত ছিলেন দেব সাহিত্য কুটিরের ডিরেক্টর রূপা মজুমদার। ছিলেন লেখক চন্ডী মুখোপাধ্যায়, সুমিতাভ ঘোষাল, পার্থ মুখোপাধ্যায়, সোমনাথ সাউ এবং অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে কবিতাপাঠ করেন বহু বিশিষ্ট কবি।

সম্প্রতি এক উজ্জল রবিবারে উত্তরপাড়ায় শিবাশ্রমে অনাথ শিশুদের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ সহযোগে জন্মদিন পালন করলেন নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য, রূপকথা ভট্টাচার্য ও প্রভাত ভট্টাচার্য। সংস্থাটির সঙ্গে পরিচিত করিয়ে সহযোগিতা করেছেন ‘মানুষের সাথে কাজ করার অঙ্গীকার’ সংগঠনের সমাজসেবী বিশ্বজিত সাহা ও শৌভিক কর্মকার ।

যোগাযোগ

ইমেইল

write@banglastreet.online

ফোন (ভারত)

+91 33 4062 1285

ফোন (বাংলাদেশ)

01924935620

ঠিকানা (ভারত)

CE 17, 3rd Cross Road,
Sector 1, Salt Lake, Kolkata,
West Bengal 700064

ঠিকানা (বাংলাদেশ)

House No.27B, 1st Floor,
Road-3 Dhanmondi,
Dhaka 1205

বাংলা স্ট্রিট অনলাইন

আধুনিক বাঙালির ফেভারিট লোকেশন